ISSN 2072-3334
Development Compilation
Volume 09. Number 01. July 2013

বালাকোট বিদ্রোহের নতুন মাত্রা : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

মো. কামাল হোসেন*

সারসংক্ষেপ : ১৮৩১ সালের বালাকোট বিদ্রোহ ছিল ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে একটি ঐতিহাসিক আন্দোলন। এ আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব ছিলেন সায়্যেদ আহমদ শহিদ বেরেলভী। প্রবন্ধে বালাকোট বিদ্রোহের অন্যতম উদ্দেশ্য ভারতীয় সাধারণ মুসলমানদের জাগ্রত ও ঐক্যবদ্ধ করার তাৎপর্যময় দিক তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়াও এ আন্দোলনের ধারাবাহিকতার মাধ্যমে পরবর্তীতে সংঘটিত ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করা হয়েছে। পরিশেষে শিখ ও ইংরেজদের ষড়যন্ত্রে বালাকোট বিদ্রোহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার মাধ্যমে এর চেতনা ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে কীভাবে উৎসাহ জুগিয়েছিল তা অনুন্ধান করার প্রয়াস চালানো হয়েছে। প্রবন্ধে মূলত মাধ্যমিক উৎস, যথা: সংশ্লিষ্ট গ্রন্থ পত্র-পত্রিকা, বিভিন্ন প্রবন্ধের সাহায্য নেয়া হয়েছে।

সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীর (১৬৫৮-১৭০৭)-এর মৃত্যুর পর দিল্লীর কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ায় আঞ্চলিক শাসকরা সিংহাসন দখলের লড়াইয়ে মেতে ওঠে। অন্যদিকে মুসলিম রাজপরিবারগুলো আত্মকলহে লিপ্ত হয় এবং পশ্চিমে শিখ শক্তি, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে মারাঠাগণ বিলীয়মান মুঘল সাম্রাজ্যে নিজেদের আধিপত্য বিস্তারে উদ্যত হয়। ভারতের এ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার সুযোগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষে ব্যবসার অন্তরালে রাজত্ব বিস্তারের সুযোগ নেয়। ইংরেজ ষড়যন্ত্রের প্রেক্ষিতে সংঘটিত ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে কোম্পানীর কাছে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পতনের মধ্য দিয়ে ইংরেজ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর তারা ভারতীয় রাজন্যবর্গের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কৌশলে ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতা দখল করে দীর্ঘ ১৯০ বছর ভারত শাসন করে[১]। ইংরেজরা ভারতের কেন্দ্রীয় শাসন ক্ষমতা দখল করার পর আলিমগণ সংগ্রামী ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তাঁরা ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জন করা পর্যন্ত ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি এবং স্বাধীনতা সংগ্রাম অব্যাহত রাখেন[২]। অষ্টাদশ শতকে ইসলামী বিশ্বের অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ (১৭০৩-১৭৬২) মুসলিম সমাজকে সর্বপ্রকার কুসংস্কার হতে রক্ষা করার জন্য ধর্মীয় সংস্কারের দিকে একটি বৌদ্ধিক আন্দোলনে মনোযোগ দেন।

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

মহান পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ১৮০৩ সালে শাহ্ আব্দুল আযীয আরও অগ্রগামী হয়ে ভারতবর্ষকে 'দারুল হরব' ঘোষণা করেন এবং ব্রিটিশ শক্তিকে দেশ থেকে উৎখাত করার জন্য দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবেলার নির্দেশ দেন। এ ফতোয়া বাস্তবায়নের উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেন সায়্যেদ আহমদ শহিদ বেরেলবী (১৭৮৬-১৮৩১) এবং তাঁর দুই সহকারী আব্দুল হক ও শাহ্ ইসমাইল শহিদ (১৭৭৯-১৮৩১)। যার পরিণতি ১৮৩১ সালের বালাকোটের ট্রাজেডি। শাহ্ আব্দুল আযীযের নির্দেশেই সায়্যেদ আহমদ বেরেলবী রাজপুতনার টঙ্ক আমীর আলী খানের শিবিরে প্রশিক্ষণ নেয়ার জন্য যোগ দেন[৩] এবং তিনি মারাঠা প্রধান জসবন্তরাও হলকারের সাথে একত্রে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। টঙ্ক আমীর আলী খান ১৮১৭ সালে ব্রিটিশদের সাথে শান্তি চুক্তি করলে সায়্যেদ আহমদ শিবির ত্যাগ করে দিল্লী চলে আসেন[৪] এবং ১৮২২ সালে হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় গমন করেন। ১৮২৩ সালে দেশে প্রত্যাবর্তন করে পেশোয়ার সীমান্তে পাঞ্জাবের শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সূত্রপাত করেন। কিন্তু কেন তিনি পূর্বের রণকৌশলের পরিবর্তন করে ব্রিটিশবিরোধী জিহাদের রাশ টানলেন এবং শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লেন? ব্রিটিশ সরকার কেন যুদ্ধকালীন নীরব ছিল? তাহলে কি বলা যায় যে এ যুদ্ধে ব্রিটিশ-ভারত সরকারের ইন্ধন ছিল? প্রশ্নগুলোর উত্তরের তাগিদেই বালকোট বিদ্রোহের নতুন দিক অনুসন্ধানের জন্য আলোচ্য প্রবন্ধ উপস্থাপনের প্রয়াস রইল।

ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাকস্বাধীনতা যুগে স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে সায়্যেদ আহমদ শহিদ বেরেলবী আলোচিত ব্যক্তিত্ব। বাংলা ভাষায় তাঁর সম্পর্কে আলোচনা খুবই স্বল্প, বিক্ষিপ্ত এবং অনেকাংশে অসম্পূর্ণ। অথচ এক সময় তিনি ভারতীয় স্তরের একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বই ছিলেন তা নয়, অনেক দিন ধরে সর্বভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তিনি ছিলেন মুষ্টিমেয় রাজনৈতিক নেতাদের অন্যতম। যাঁরা জন্মভূমিকে পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করতে সশস্ত্র সংগ্রামের আদর্শ লালন করেছিলেন, তা সংগঠিত করতে যত্নবান ছিলেন এবং ১৮৩১ সালে বালাকোট যুদ্ধে জীবন উৎসর্গ করেন।

ভারতীয় উপমহাদেশের উনিশ শতকের প্রথমার্ধের ঘটনাবহুল যুগ সন্ধিক্ষণের এক ব্যক্তি সায়্যেদ আহমেদ শহিদ বেরেলবীকে আজকের আকাশ সংস্কৃতির যুগে আধুনিক ঐতিহাসিকরা কীরূপ দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখবেন? অধ্যাপক কার ক্রোচের সাথে সুর মিলিয়ে বলেন যে, ঐতিহাসিক তাঁর আপন যুগের চিন্তা ভাবনার নিরিখে এবং নিজের চোখ ও মন দিয়ে দেখবেন। প্রসঙ্গত কার মনে করেন, কোন ব্যক্তির ইতিহাস রচনা করতে হলে প্রথমেই বুঝতে হবে ব্যক্তিটি কতটুকু ব্যক্তিসভা আর কতটুকু সামাজিক সত্তা[৫]।

পলাশী যুদ্ধে বিপর্যয়ের পর মুসলমানদের রাজনৈতিক সংকট শুরু হয় এবং মুসলমানদের উপর নেমে আসে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন, শোষণ, জুলুম, অত্যাচার, অনাচার ও দমননীতি[৬]। ইংরেজরা ভারতে এসেছিল বাণিজ্য বিস্তার ও অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে, কোন আদর্শের বার্তা নিয়ে নয়। কিন্তু ভারতের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক দুর্বলতা ও

বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে কৌশলে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ও শাসনক্ষমতা দখল করে (১৭৫৭- ১৯৪৭) ভারত শাসন ও শোষণ করে[৭]।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষে আসার পর থেকেই সমকালীন মুসলিম চিন্তাবিদ, সমাজ সংস্কারক, ধর্মীয় নেতা ও স্বাধীনতাকামী মুসলমানগণ শাসকদের সতর্ক করেছিলেন। কিন্তু ইংরেজদের কেন্দ্রীয় শাসন ক্ষমতা দখল করার পর স্বাধীনতাকামী মুসলমানগণ আজাদীর জন্য সংগ্রামী ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তাঁরা সর্বত্র বিদ্রোহ ও স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনা করেন[৮]। বিভাগ পূর্ব ভারতকে মুসলমানরা নিজেদের জন্মভূমি বলে গ্রহণ করেছিল। কোনদিন তারা নিজেদের বহিরাগত বলে মনে করে নি। দেশের শান্তিরক্ষা, স্বাধীনতা রক্ষাকেও তাদের নিজেদের কর্তব্য ও দায়িত্ব বলে মনে করেছিল। বলা বাহুল্য, মুসলমান বলে ইসলামী নীতিসমূহ তারা ঈমানের অংশ ছিল[৯]। আর এজন্যই তাদের এ সংগ্রাম ১৯৪৭ সালের ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ করা পর্যন্ত অব্যাহত ছিল[১০]।

শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ ভারতের মুঘল সাম্রাজ্যের সামাজিক অবক্ষয় ও রাজনৈতিক পতন রোধে বিশুদ্ধ শিক্ষা, বিশুদ্ধ ধর্মনীতি, নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিক পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে এর মোকাবেলা করতে উদ্যোগী হন। এ কারণেই তাঁকে মুসলিম প্রাচ্যবিদ স্কলার ড. ফজলুর রহমান 'সিংকার অব ক্রাইসিস' রূপে অভিহিত করেন[১১]। সম্রাট আলমগীরের মৃত্যুর পর সম্ভাব্য সকল উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়ে যায় এবং সাম্রাজ্যের পতন ও অবনতি দ্রুত এগিয়ে আসে। বিভিন্ন আন্দোলন ও আক্রমণে দেশ অবনতির চরমে পৌঁছে গিয়েছিল। এ সময় শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ নৈতিক ও ধর্মীয় অবক্ষয় এবং দিল্লীর রাজনৈতিক বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা রোধকল্পে ৫মে ১৭৩১ সালে একটি বৈপ্লবিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। যা ওয়ালীউল্লাহী আন্দোলন নামে খ্যাত[১২]। এ আন্দোলনের মাধ্যমে তিনি মুসলমানদের আত্মশুদ্ধির পরামর্শ দেন এবং ক্ষয়িষ্ণু, দুর্বল ও বিজাতীয় সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট মুঘল সম্রাটদের সংশোধনের চেষ্টা করেন এবং মুসলিম সাম্রাজ্য উদ্ধারের পরামর্শ দেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত যতগুলো ইসলামী আন্দোলন হয়েছে, রাজনৈতিক হোক বা অরাজনৈতিক হোক এ সবগুলোর ভিত্তি হলো ওয়ালীউল্লাহী আন্দোলনের মূলনীতি। ১৭৬২ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁরই জ্যেষ্ঠপুত্র ও শিষ্য সিরাজুল হিন্দ শাহ 'আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলবী (রঃ)(১৭৪৬-১৮২৩) ওয়ালীউল্লাহী আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র সতের বছর। শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ যে আন্দোলনের বীজ বপন করেছিলেন, তার উত্তরসূরী আব্দুল আযীযের হাতে বিশাল বৃক্ষে পরিণত হয়। তাঁর আমল ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আর্থিক শোষণ আর রাজ্য বিস্তারের যুগ। পিতার ন্যায় তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল ইসলামী হুকুমত কায়েম করা। দীর্ঘ ষাট বছর ধরে তিনি এ প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। তাঁর সময়ে ইংরেজ শাসনের প্রতি খোলাখুলি বিদ্রোহ করা মোটেও সম্ভব ছিল না। তাই তিনিও আন্দোলনকে পিতার ন্যায় সংস্কারমূলক

আন্দোলন রূপে পরিচালনা করেন। তাঁর এ আন্দোলনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ মুসলমানদেরকে জাগ্রত ও ঐক্যবদ্ধ করা[১৩]। শাহ্ আবদুল আযিয ও তাঁর জামাতা মাওলানা আব্দুল হাই (মৃ:১৮২৮) উনিশ শতকের প্রথমভাগে অত্যন্ত সাহসিকতরি সাথে ইংরেজ অধিকারভুক্ত এলাকাকে 'দারুল হরব' বলে ফতোয়া দেন[১৪]।

এ ঘোষণায় ভারতের মুসলমানরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। কোম্পানীর এ দাম্ভিক উচ্চারণের প্রতিবাদে শাহ্ আব্দুল আযীয (রঃ) ১৮০৩ খ্রিষ্টাব্দে ঘোষণা করেন- "When Infidels get hold of a Muhammadan Country it becomes impossible for the Musalmans of the Country, and of the people of the neighbouring destriots to drive them away, or to retain reasonable hope of ever doing so; and the power of the infidels increases to such an extent that they can abolish to retain the ordinances of Islam according to their pleasare; and no one is strong enough to seize on the revenues of the country without the permission of the Infidels; and the (Musalman) in- habitants do no longer live so secure as before; such a country is politically a country of the enemy (Dar-al-harb)".[১৫]

শাহ্ আব্দুল আযীয (রঃ) পরবর্তীতে তাঁর এ আন্দোলন কর্মসূচি অব্যাহত রাখার জন্য তাঁর সুযোগ্য ছাত্র ও খলিফা সায়্যেদ আহমদ শহিদ বেরেলবী (রঃ)-এর হাতে অর্পণ করেন। তিনি সায়্যেদ আহমদকে মা'রিফতের জ্ঞান দান করেন এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেন[১৬]। শাহ্ আব্দুল আযীযের উপদেশ মতে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র, ছাত্র ও শিষ্য শাহ মুহাম্মদ ইসমাইল শহিদ (১৭৮২-১৮৩১) এবং জামাতা মৌলবী আব্দুল হাই সায়্যেদ আহমদের হাতে বায়আত গ্রহণ করেন[১৭]। এতে সায়্যেদ আহমদের দলে নতুন শক্তি সঞ্চারিত হয়। সায়্যেদ আহমদ নিজ এলাকা থেকে শুরু করে সারা ভারত পরিভ্রমণ করে লক্ষ লক্ষ সমর্থক ও শিষ্য সংগ্রহ করেন এবং তাদের মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামের আগুন ছড়িয়ে দিতে সমর্থ হন[১৮]। তাঁর এই বিশাল কর্মী বাহিনী শুধু মুসলমানদের মধ্যে সীমিত ছিল না; বরং অনেক অমুসলিমও এতে অংশগ্রহণ করেন[১৯]।

আহমদ শহীদ এবং তাঁর অনুগতরা ওয়ালীউল্লাহ্র চিন্তাধারায় অণুপ্রাণিত হয়ে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট ছিলেন[২০]। এ প্রসংগে Mohiuddin Ahmad বলেন, "Saiyid Ahmad Shahid must have been aware of the famous religions injunction issued by his mentor, Shah Abdul Aziz"[২১].

সায়্যেদ আহমদ শহিদ বেরেলবী ইংরেজদের বিরুদ্ধে আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এ সময় পাঞ্জাবের শিখ নেতা রনজিত সিংহ (১৭৮০-১৮৩৯)-এর নেতৃত্বে মুসলমানদের উপর অত্যাচার ও নির্যাতন চলতে থাকে। এজন্য সায়্যেদ আহমদ ২১ ডিসেম্বর ১৮২৬ সালে রনজিত সিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং তা ১৮৩১ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছর সফলতার সাথে চালিয়ে যান। ১৮৩১ সালে ৬মে শিখ ও ইংরেজ ষড়যন্ত্র এবং পাঠানদের বিশ্বাসঘাতকতায় (পায়েন্দা খান ও নযফ খানের সহায়তায়) রনজিত সিংহের সেনাপতি

শেরসিংহের অতর্কিত আক্রমণে সায়্যেদ আহমদ ও তাঁর সহকারী শাহ্ ইসমাল শহিদ বীর বিক্রমে যুদ্ধ করতে করতে শাহাদত বরণ করেন[২২]। অতঃপর সায়্যেদ আহমদের দুই শিষ্য মাওলানা বিলায়ত আলী ও ইনায়ত আলী পাটনার সাদিকপুরকে কেন্দ্রস্থল করে লড়াই চালিয়ে যান। পাঞ্জাব ইংরেজ কর্তৃক বিজিত (১৮৪৯-১৮৫০) হলে ইংরেজদের সাথে মুজাহিদদের প্রত্যক্ষ লড়াই শুরু হয়[২৩]। তাঁরা সুযোগ বুঝে ইংরেজদের উপর ঝাপিয়ে পড়েন। তাঁদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সংঘটিত হয় ১৮৫৭'র স্বাধীনতা আন্দোলন। তখন হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজির-এ মক্কী (রঃ)-এর নেতৃত্বে শ্যামলী এলাকায় একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে মাওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানূতবী (রঃ) সিপাহসালার এবং মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গূহী ছিলেন কাযীউলকুযাত। তাঁরা শ্যামলীর যুদ্ধে জয়লাভ করেন। কিন্তু ইংরেজদের আধুনিক সমরাস্ত্রের সামনে হিন্দু-মুসলিম সম্মিলিত বাহিনী পরাস্ত হয়। ১৮৬৩ সালে সীমান্তের মুজাহিদ বাহিনীর সাথে ইংরেজ বাহিনীর আরো একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এভাবে ১৮৫০-১৮৬৩ সাল পর্যন্ত আলিমগনের নেতৃত্বে ৬৩টি যুদ্ধ পরিচালিত হয়[২৪]।

সায়্যেদ আহমদ শহীদ বেরেলবী (রঃ) ছিলেন ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক মনীষী এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সেনানী। সায়্যেদ আহমদ তদানীন্তন ভারতের অযোধ্যা প্রদেশের অন্তর্গত রায়বেরেলী সংলগ্ন তাকীয়া নামক স্থানে ১৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম সায়্যেদ মুহাম্মদ ইরফান[২৫]। ১৮০৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বিদ্যা ও শিষ্টাচার শিক্ষার উদ্দেশ্যে শাহ আব্দুল আযীয (রঃ)- এর খেদমতে উপস্থিত হলে তাঁকে শাহ্ আব্দুল কাদির-এর তত্ত্বাবধানে সোপর্দ করেন। তিনি তাঁকে কুরআন, হাদীস ও তাফসীর শিক্ষা দেন। ২২ বছর বয়সে সায়্যেদ আহমদ শাহ্ আব্দুল আযীযের হাতে বায়'আত গ্রহণ করে খিলাফত লাভ করেন[২৬] এবং ঐ বছরই (১৮০৮) তিনি জন্মস্থানে ফিরে যান। ১৮১০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি টঙ্কের নবাব আমীর খানের অধীনে সিপাহীর চাকুরী গ্রহণ করেন[২৭]। সেদিন তিনি মারাঠা প্রধান জসবন্তরাও হলকারের সাথে একত্রে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে শরিক হয়েছিলেন। ১৮১৭ সালে টঙ্কের নবাব ইংরেজদের সাথে আপোষ চুক্তি করলে তিনি সিপাহীর চাকুরী ছেড়ে দিয়ে দিল্লীতে শায়খ শাহ্ আব্দুল আযীযের নিকট চলে আসেন। ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি শাহ ইসমাইল শহীদ ও শাহ আব্দুল কাদিরসহ প্রায় চারশ' শিষ্য নিয়ে হজ্জ পালন করতে মক্কা যান[২৮]। ১৮২৩ খ্রিষ্টাব্দে মক্কা হতে ভারতে প্রত্যাবর্তন করে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তখন থেকে ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দে শাহাদত বরণ করা পর্যন্ত দীর্ঘ আট বছর ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনা করেন। তাঁর সশস্ত্র সংগ্রাম ছিল পাঞ্জাবের শিখ রাজা রনজিত সিংহের বিরুদ্ধে[২৯]।

ইংরেজদের বৈরিতার কারণে এবং ভারতবর্ষকে 'দারুল হরব' ঘোষণা করায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রস্তুতি চলতে থাকে। প্রয়োজনের তাগিদে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার পূর্বে শিখদের সাথে যুদ্ধ করতে হয়। সায়্যেদ আহমদ বেরেলবী যে সময়ে ইংরেজদের

বিরুদ্ধে সম্মিলিত আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন ঠিক সে সময়ে উনিশ শতকের প্রথমে রনজিত সিংহ (১৭৮০-১৮৩৯) কর্তৃক পাঞ্জাবে শিখদের একটি শক্তিশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময়ে শিখদের অত্যাচারে মুসলমানদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠে। এজন্য তিনি ১৮২৬ সালের ২১ ডিসেম্বর রনজিত সিংহের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন। সমগ্র উপমহাদেশ থেকে এক লক্ষেরও বেশি সৈন্য তাঁর মুজাহিদ বাহিনীতে যোগদান করেন[৩০]। তিনি মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে ভারত সীমান্তে উপনীত হন এবং নওশেরা থেকে ৮ মাইল দূরে অবস্থিত আকূরা নামক স্থানে শিখদের সাথে তুমুল যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে মুজাহিদগণ জয়লাভ করেন[৩১]। সেখানে তিনি পাঠান গোত্রের সহায়তায় ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করেন। খুলফা রাশিদুনের আদলে তিনি ইসলামের খলিফা আমীরুল মুমিনীন নিযুক্ত হন। তাঁর নামে চালু করা হয়[৩২]।

কিন্তু পরবর্তীকালে এ পাঠানদের বিশ্বাসঘাতকতাই মুজাহিদদের পরাজয়ের কারণ হয়। মুসলমানদের এ বিজয়ে ভীত হয়ে ইংরেজগণ শিখদের গোপনে সাহায্য করতে আরম্ভ করে এবং তাঁর অনুগামীদের উপর উৎপীড়ন শুরু করে। শিখদের সাথে ১৮২৬- ১৮৩১ সাল পর্যন্ত জিহাদ চলে। ইংরেজ কেনিয়া ও শিখ গোত্রের সম্মিলিত চক্রান্তের ফলে তিনি তাঁর অনুগামীর ছদ্মাবরণে সীমান্তের এক মুসলিম বিশ্বাসঘাতকের সক্রিয় সহায়তায় বালাকোট নামক স্থানে ১৮৩১ স্থানের ৬ মে রনজিত সিংহের সেনাপতি শেরসিংহ সায়্যেদ আহমদ ও শাহ্ ইসমাইলকে অতর্কিত আক্রমণ করে। হঠাৎ মুজাহিদ বাহিনীর প্রধান অংশ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁরা দুজন অল্প সংখ্যক অনুগামীসহ বীরের ন্যায় যুদ্ধ করতে করতে শাহাদত বরণ করেন[৩৩]। মুজাহিদ বাহিনীর প্রধান অংশ নেতৃত্বহীন অবস্থায় বিশৃঙ্খলভাবে যুদ্ধ করতে করতে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। পরে এই মুজাহিদ বাহিনী পুনরায় সিডানায় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করেন[৩৪]।

সায়্যেদ আহমদ শহীদ (রঃ) যখন সীমান্তে শিখদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত, তখন তাঁর এক শিষ্য চেতনার অগ্নিপুরুষ সায়্যিদ নিসার আলী ওরফে তিতুমীর বাংলাদেশে মুসলিম কৃষকদেরকে নিয়ে হিন্দু জমিদারদের উৎপীড়ন, নীল কুঠির অত্যাচারী সাহেব ও দালালদের নির্যাতন থেকে মুক্তির জন্য একটি সংঘবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলে কৃষক ও তাঁতীদের রক্ষা করার প্রয়াস পান[৩৫]। তিনি স্বাধীনভাবে স্বীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন চব্বিশ পরগনা, নদীয়া ও ফরিদপুরের কিয়দাংশে। তিতুমীর ব্রিটিশদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হন বেশ কয়েকবার। অবশেষে ১৮৩১ সালে নারিকেলবাড়িয়ায় বাঁশের কেল্লায় অবস্থান করে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে শাহাদত বরণ করেন[৩৬]।

১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দের ৬ মে বালাকোটের যুদ্ধে সায়্যেদ আহমদ শহিদ, শাহ্ ইসমাইল শহিদ ও অন্যান্য মুজাহিদগণের শাহাদাতের পর জিহাদ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন সায়্যেদ আহমদের দুই শিষ্য মাওলানা বিলায়াত আলী ও মাওলানা ইনায়াত আলী[৩৭]। তাঁদের নেতৃত্বে সারা ভারতে আবার ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে এবং তা সশস্ত্র জিহাদের রূপ নেয়।

দেশের সর্বত্র কৃষকরা জমিদার ও নীলকুঠিওয়ালাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেন। সাথে সাথে নানাবিধ আইন, ফরমান ও ঘোষণার মাধ্যমে ভারতের শাসনব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন আসে। ফারসির স্থলে ইংরেজিকে সরকারি ভাষা ঘোষণা করে। মুসলমানদের ঈমান-আকীদা ধ্বংসের অপকৌশল হিসেবে শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তনের মাধ্যমে ইলমে দ্বীন চর্চা ও মুসলিম জ্ঞানসাধনার পথ সঙ্কুচিত করে[৩৮]।

সায়্যেদ আহমদ শহিদ বেরেলবীর নেতৃত্বে আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন ব্রিটিশ সরকার আন্দোলনকে দমিয়ে রাখার জন্য কৌশল হিসেবে মুসলমানদের অন্তরে ঘৃণা জন্মাবার উদ্দেশ্যে কাল্পনিকভাবে সায়্যেদ আহমদ শহিদের আন্দোলনকে তারা মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর (১৭০৩-১৭৮৭) 'ওহাবী আন্দোলন'-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত করে দেয়। নিজের দলের লোক ব্যতীত ওহাবীরা অন্যান্য মুসলমানদেকে মুশরিক ও কাফির বলে বিশ্বাস করে এবং তাদের হত্যা করা ও তাদের মালামাল লুট করা জায়েজ মনে করে। ১৮২৩ সালে আহমদ শহিদ তাঁর অনুসারীদের নিয়ে !!!হজ্জব্রত পালনকালে মক্কা, মদীনা ও নজদের কোন শহর বা গ্রামেও ওহাবী আন্দেলন ছিল না। ১৮১৮ সালে ঐ অঞ্চলগুলো থেকে মিশরীয় সেনাবাহিনী ওহাবীদের উৎখাত করে। যারা বেঁচে ছিল তারা বনে-জঙ্গলে এবং পাহাড়-পর্বতে পলায়ন করে আত্মরক্ষা করে[৩৯]। এ প্রসংগে W.W. Hunter বলেন,"অবশেষে মিশরের গভর্নর মুহাম্মদ আলী পাশা সংস্করকগণকে (আবদুল ওহাব এবং তাঁর দল) সমূলে নিশ্চিহ্ন করে দেয়[৪০]।" আহমদ শহিদের হজ্জব্রত পালন করার সময় ওহাবীদের কোন অস্তিত্বই ছিল না। তাই তাঁদের মতবাদ সম্পর্কে তাঁর অবগত হওয়ার প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে না। তাঁকে ওহাবী বলা ইংরেজদের ষড়যন্ত্র ও প্রোপাগান্ডা ছাড়া কিছু না[৪১]। সায়্যেদ আহমদ ও তাঁর অনুসারীরা ওহাবী চিন্তাধারায় প্রভাবিত ছিল না; বরং তাঁরা শাহ্ ওয়ালীউল্লাহর চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সদা সচেষ্ট ছিলেন[৪২]। ঐতিহাসিক বিচারে ওহাবী আন্দোলন ছিল পুনরুজ্জীবন বাদী। এ আন্দোলনে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি ছিল প্রচন্ড এবং সংস্কারের উদ্দেশ্য- নয়া পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়ানো নয়। এবং সকল ধরনের নতুনত্ব অস্বীকার করে ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ের জীবনে প্রর্ত্যাবর্তন করা[৪৩]।

সায়্যেদ আহমদ বেরেলবীর রাজনৈতিক চিন্তাধারা তথা আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার জন্য ইংরেজরা এ আন্দোলনকে ওহাবী আন্দোলন বলে চালিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা করেছে। কিন্তু ঐতিহাসিক বিচারে তা প্রমাণিত হয় না। ব্রিটিশ শাসনাধীনে মুসলমান ও শিখরা উভয়েই ভারতে জিম্মি ছিলেন। মুসলিম জিম্মিরা শিখ জিম্মিদের সাথে যুদ্ধ করবে আর শাসক ইংরেজরা দর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারে না। কেননা ভারতের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব শাসক ইংরেজদের। কিন্তু তারা শিখদের পক্ষ অবলম্বন করে মুসলিমদের ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। সুতরাং বেরেলবী সম্পর্কে ইংরেজদের যুক্তিতে নানা ধরনের মিথ্যা ও ভাবালুতার প্রাধান্য থাকাই স্বাভাবিক। শিখ ও ইংরেজ ষড়যন্ত্রে ১৮৩১ সালে

বালাকোট যুদ্ধে আহমদ শহিদ বেরেলবীর মৃত্যু হলেও তাঁর চিন্তাধারা পরবর্তীতে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে উৎসাহ জুগিয়েছিল।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. রহিম, এম.এ, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ: ১২-১৩।

২. হুসাইন আহমদ মাদানী, মাওলানা, সায়্যিদ, *নকশ-এ হায়াত*, ২য় খণ্ড, মাকতবা-এ দ্বীনিয়াহ, দেওবন্দ, ১৯৫৩, পৃ: ৩২।

3. Malik, Hafeez, *Moslem Nationalism in India and Pakistan*, Public Affairs press, Washington, D.C. 1963, pp. 152-154,159-161.

৪. Malik, Hafeez, *Moslem Nationalism in India and Pakistan*, Public Affairs press, Washington, D.C. 1963, pp. 152-154,159-161.

৫. লেখকের অপ্রকাশিত এম.ফিল থিসিস, *ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীর ভূমিকা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ফেব্রুয়ারী ২০০৯, পৃ: ভূমিকা দ্রষ্টাব্য।

৬. মাহমুদুল হাসান, সৈয়দ, ড., *'ভারতবর্ষের ইতিহাস'* গ্লোব লাইব্রেরি (প্রাঃ) লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ৫৫৭।

৭. রহিম, এম, এ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২- ১৩।

৮. *নকশ-এ হায়াত*, *প্রাগুক্ত*, পৃ: ৩২।

৯. ওয়াহিদ, আবদুল, *'উপমহাদেশের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা ও মুসলমান'*, ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৩, পৃ.৩।

১০. আবদুল জলিল, এ. এম. এম, *'দেওবন্দ আন্দোলন একটি জিহাদ'* ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা-১৯৮৩, পৃ. ৯৩।

১১. *'ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা'*, ঢাকা, ৪২ বর্ষ, ২য় সংখ্যা (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০২), পৃ. ১৬৪।

১২. উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী, মাওলানা, শাহ ওয়ালিউল্লাহ আওর উনকী সিয়ামী তাহরীক, সিন্ধ সাগর একাডেমী, লাহোর, ১৯৫২,পৃ: ৫।

১৩. আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ, *'স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁর ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা'*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮২ পৃ. ৩১-৩২।

১৪. *Shorter Encyclopaedia of Islam*, E.J.Brill, Lieden, 1953, p.68.

১৫. Hunter, W.W. , *Ibid*, P- 191.

১৬. ইনাম-উল-হক, মুহাম্মদ, ড., *'ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন'*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৯।

১৭. নকশ-এ- হায়াত, ২য় খণ্ড,*প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯- ২০।

১৮. Faruqi, Ziaul-Ul-Hasan, *Deobond School and the Demand for Pakistan*, Asia Puplishing House, Bombay, 1963, p. 7.

১৯. নকশ-এ-হায়াতা, ২য় খণ্ড, *প্রাগুক্ত*. পৃ. ১১- ১২।

২০. Malik, Hafeez, *Ibid* , p. 191.

২১. Ahmad, Mohiuddin, *Saiyid Ahmad Shahid, His Life And Mission*, Academy of Islamic Reserch and publications, lacknow, India, 1975, p.115.

২২. লেখকের অপ্রকাশিত এম.ফিল থিসিস, *প্রাগুক্ত*, পৃ: ২০-২১।

২৩. আবদুল্লাহ্, মুহাম্মদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫-৩৬।
২৪. মোদাব্বের, মোহাম্মদ, *ইতিহাস কথা কয়*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃঃ ১১৯-১২০; ইনাম-উল- হক, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৯-১০।
২৫. Malik, Hafeez, *Ibid* , p. 154.
২৬. Nadwi, Abul Hasan Ali, *Sirat Saiyid Ahmad Shahid*, Vol-I, Lahore,1958, p.5.
২৭. Ahmad, Mohiuddin, *Ibid*, p.43.
২৮. Faruqi, Ziaul-Ul-Hasan, *Ibid*, p.7.
২৯. লেখকের অপ্রকাশিত এম.ফিল থিসিস, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১১-১২।
৩০. আবদুল জলিল, এ. এম. এম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১।
৩১. নকশ-এ-হায়তা, ২য় খণ্ড, *প্রাগুক্ত*. পৃ. ১২-১৬।
৩২. আবদুল জলিল, এ. এম. এম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮০।
৩৩. আবদুল্লাহ্, মুহাম্মদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩।
৩৪. Faruqi, Ziaul-Ul-Hasan, *Ibid*, p.9.
৩৫. আহমদ মোর্তজা, গোলাম, '*চেপে রাখা ইতিহাস*' ৮ম সংস্করণ, বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন, বর্ধমান, ২০০০, পৃ. ২১১- ২১২।
৩৬. মাহমুদুল হাসান, সৈয়দ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬০- ৫৬১, ইনাম-উল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩- ২৮।
৩৭. *নকশ-এ হায়াত*, ২য় খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ৪৩১।
৩৮. W.W. Hunter *The Indian Musalmans,* The Comrade Publishers, Calcutta, 1945, p. 43.
৩৯. *নকশ-এ হায়াত*, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪৩২।
৪০. Malik, Hafeez, *Ibid*, p. 191.
৪১. লেখকের অপ্রকাশিত এম.ফিল থিসিস, *প্রাগুক্ত*,পৃ-৭।
৪২. আব্দুল মান্নান, সৈয়দ (অনূ), *মুজাহিদ বাহিনীর ইতিবৃত্ত*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ.২৪৮।
৪৩. আবদুল জলিল, এ. এম. এম, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১০৩।